ভূমিকা

প্রার্থী সম্পর্কে জানার অধিকার ভোটারের মৌলিক অধিকার

ভারতীয় সুপ্রিম কোর্ট *Union of India v. Association of Democratic Reforms* [(2002) 5 SCC 294] মামলায় ২০০২ সালে প্রদত্ত এক ঐতিহাসিক রায়ে বলেন:

'Under our Constitution, Article 19(1)(a) provides for freedom of speech and expression. Voter's speech or expression in case of election would include casting of votes, that is to say, voter speaks out or expresses by casting vote. For this purpose, information about the candidate to be selected is a must. Voter's (little man – citizen's) right to know antecedents including criminal past of his candidate contesting election for MP or MLA is much more fundamental and basic for survival of democracy. The little man may think over before making his choice of electing law-breakers as law-makers.'

['আমাদের সংবিধানের ১৯(১)(ক) অনুচ্ছেদে বাক্ ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার কথা বলা আছে। নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভোট প্রদান ভোটারের মত প্রকাশের স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত, অর্থাৎ ভোটার মত প্রকাশ বা বাক্ স্বাধীনতা প্রয়োগ করেন ভোট প্রদানের মাধ্যমে। এ কারণে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের সম্পর্কে ভোটারদের তথ্য পাওয়া জরুরি। গণতন্ত্র টিকে থাকার জন্য এমপি ও এমএলএ (প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য) পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের অতীত সম্পর্কে – তাদের অপরাধসংক্রান্ত অতীতসহ – ভোটারের (ক্ষুদ্র ব্যক্তিটি তথা নাগরিকের) জানা অতি প্রয়োজন ও গুরুত্বপূর্ণ। যাতে করে সেই ক্ষুদ্র ব্যক্তিটিও একজন আইনভঙ্গকারীকে আইন-প্রণেতা হিসেবে নির্বাচন করবেন কি না, তা আগেই বিবেচনায় আনতে পারেন।']

পরবর্তী সময়ে ভারতীয় সুপ্রিম কোর্ট আরেকটি রায়ে [*PUCL v. Union of India* (2003) 4 SCC] সুস্পষ্টভাবে বলেছেন:

'It is true that elections are fought by political parties, yet election would be a farce if the voters are unaware of the antecedents of candidates contesting elections. Their decision to vote either in favour of A or B candidate would be without any basis. Such election would be neither free nor fair.'

['এ কথা সত্য যে রাজনৈতিক দলগুলোই নির্বাচনী যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তবে নির্বাচন প্রহসনে পরিণত হবে, যদি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের অতীত ইতিহাস সম্পর্কে ভোটাররা না জানেন। তাদের 'এ' কিংবা 'বি'-এর পক্ষে ভোট দেওয়ার কোনো ভিত্তি থাকবে না। এধরনের নির্বাচন সুষ্ঠু হবে না, নিরপেক্ষও না।']

বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ ভারতীয় উচ্চ আদালতের এই রায়গুলোর সঙ্গে একমত পোষণ করে ২৪ মে ২০০৫ তারিখে '*আব্দুল মোমেন চৌধুরী ও অন্যান্য বনাম বাংলাদেশ*' (২০০৫ সালের রিট পিটিশন নং ৫৭) মামলায় এক যুগান্তকারী রায় দেন। রায়ে আদালত নির্বাচন কমিশনকে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সব প্রার্থী থেকে মনোনয়নপত্রের সঙ্গে আট ধরনের তথ্য হলফনামা আকারে সংগ্রহ এবং এগুলো গণমাধ্যমের সহায়তায় জনগণের মধ্যে বিতরণ করার নির্দেশ প্রদান করেন। তথ্যগুলো হলো: (১) সার্টিফিকেটসহ প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা; (২) বর্তমানে তাদের বিরুদ্ধে রুজুকৃত ফৌজদারি মামলার তালিকা (যদি থাকে); (৩) অতীতের ফৌজদারি মামলার তালিকা ও ফলাফল; (৪) প্রার্থীর পেশা; (৫) প্রার্থীর আয়ের উৎস ও উৎসসমূহ; (৬) অতীতে সংসদ সদস্য হলে জনগণের প্রতি প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পূরণ করার ক্ষেত্রে তার ভূমিকা; (৭) প্রার্থী ও প্রার্থীর ওপর নির্ভরশীলদের সম্পদ এবং দায়দেনার বর্ণনা; এবং (৮) ব্যাংক কিংবা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ব্যক্তিগতভাবে বা যৌথভাবে এবং কোম্পানি কর্তৃক – যে কোম্পানিতে প্রার্থী চেয়ারম্যান, নির্বাহী পরিচালক কিংবা পরিচালক – গৃহীত ঋণের পরিমাণ ও বর্ণনা।

বাংলাদেশে ভোটারদের তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার অর্জনের ইতিহাস

প্রার্থীদের সম্পর্কে ভোটারদের তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার আমাদের দেশে সহজে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আদালতের নির্দেশও আপনা-আপনি আসেনি। এর পেছনে একটি সুদীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে, যে ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত উচ্চ আদালতে নগ্ন জালিয়াতি, আমাদের কিছু আইনজীবী ও বিচারপতির বিতর্কিত আচরণ এবং 'সুজন'-এর মতো নাগরিক সংগঠনের সক্রিয়, সাহসী ও নিরবিচ্ছিন্ন ভূমিকা। আরও জড়িত অতীতের নির্বাচন কমিশনের অসহযোগিতা। এই ইতিহাস অনেক ক্ষেত্রে বেদনাদায়ক ও ন্যাক্কারজনক।

আমাদের রাজনীতিতে দুর্নীতি-দুর্বৃত্তায়নের সমস্যা বহুদিনের। এই সমস্যা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে ২০০২ সালের ১২ নভেম্বর ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের প্রাক্কালে সম্প্রতি প্রয়াত অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ ও বর্তমান লেখকের উদ্যোগে 'সিটিজেনস ফর ফেয়ার ইলেকশনস' (সিএফই) নামে একটি নাগরিক সংগঠন গঠন করা হয়। জনাব হাফিজউদ্দিন খান, জনাব এ এস এম শাহজাহান, জনাব সৈয়দ আবুল মকসুদ, অধ্যাপক তোফায়েল আহমেদ, জনাব জিয়াউল হক, জনাব দ্বিজেন মল্লিক, প্রয়াত জনাব আবদুল কুদ্দুসসহ বেশ কয়েকজন বরেণ্য ব্যক্তিও এই উদ্যোগের সঙ্গে প্রথম দিকেই জড়িত হন। সংগঠনের উদ্দেশ্য ছিল আসন্ন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ভোটারদের তথ্য দিয়ে ক্ষমতায়িত করা, যাতে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের নির্বাচিত হয়ে আসার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

'সিএফই'-এর উদ্যোগে পরবর্তীকালে একাধিক স্থানে ভোটারদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা করা হয়। এসব সভায় ভোটারদের কাছ থেকে জানতে চাওয়া হয়: আসন্ন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে তারা কেমন প্রার্থী চান, কী কী গুণাবলি প্রার্থীদের থাকা আবশ্যক ইত্যাদি।

ভোটারদের মতামতের ভিত্তিতে একটি প্রশ্নপত্রও তৈরি করা হয়, যা ব্যবহার করে সারা দেশের ৫৫টি ইউনিয়নে চেয়ারম্যান পদপ্রার্থীদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সম্পন্ন করেন একদল স্বেচ্ছাব্রতী মানুষ, যারা সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে প্রার্থীদের তুলনামূলক প্রোফাইল তৈরি করে সেগুলো পোস্টার হিসেবে ইউনিয়নের প্রকাশ্য স্থানে এঁটে দেন। পরবর্তীকালে ইউনিয়নগুলোতে 'ভোটার-প্রার্থী মুখোমুখি' অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

'সিএফই'-এর উদ্যোগে তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশসংক্রান্ত এসব কার্যক্রম স্থানীয় ভোটারদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগায়। তথ্য সংগ্রহের কাজে ব্যবহৃত প্রশ্নপত্রটি ছিল অত্যন্ত সাদামাটা এবং অনেক প্রার্থী সব প্রশ্নের উত্তরও দেননি। অনেকে আবার অসত্য ও বিভ্রান্তিকর তথ্য দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও উদ্যোগটি ভোটারদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ জাগায় ও গুঞ্জন সৃষ্টি করে। গুঞ্জন সৃষ্টি হয় প্রার্থীদের তথ্য গোপন করার এবং অনেক ক্ষেত্রে অসত্য তথ্য দেওয়ার বিষয় নিয়ে। নির্বাচন-পরবর্তীকালে এক জরিপ থেকে দেখা যায়, উল্লেখযোগ্যসংখ্যক ভোটার প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে তাঁদের মত পরিবর্তন করেছেন এবং ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে এমন প্রার্থীকে ভোট দিয়েছেন, যারা নির্বাচন-প্রক্রিয়ার শুরুতে তাদের প্রথম পছন্দ ছিলেন না। ফলে এসব ইউনিয়নে অপেক্ষাকৃত সৎ ও যোগ্য প্রার্থীরা, অনেক ক্ষেত্রে নির্বাচিত না হলেও, অধিক পরিমাণে ভোট পেয়েছেন।

ভোটারদের তথ্য দিয়ে ক্ষমতায়িত করার এবং মুখোমুখি অনুষ্ঠান আয়োজনের আরেকটি ইতিবাচক ফলাফলও লক্ষ করা যায়। লক্ষ করা যায়, উল্লিখিত ৫৫টি ইউনিয়নে অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং নির্বাচনে কোনোরূপ সহিংস ঘটনা ঘটেনি। পরাজিত প্রার্থীরা নির্বাচনী ফলাফল প্রত্যাখ্যানও করেননি। কোনো কোনো এলাকায় পরাজিত প্রার্থীরা বিজয়ীদের অভিনন্দিত করেছেন, এমনকি কিছু ক্ষেত্রে পরাজিত প্রার্থীরা বিজয়ীদের গলায় ফুলের মালাও পরিয়েছেন।

প্রশ্নপত্রটি ব্যবহার করে কয়েকটি পৌরসভা নির্বাচনেও একই ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় এবং তাতেও উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া পাওয়া যায়। এসব পৌরসভায়ও ভোটারদের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ লক্ষ করা যায় এবং অপেক্ষাকৃত ভালো প্রার্থীরা বেশি ভোট পান।

নির্বাচন-সংক্রান্ত কার্যক্রমের অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয় যে, প্রার্থীদের সম্পর্কে ভোটারদের শুধু তথ্য দিয়ে ক্ষমতায়িত করাই যথেষ্ট নয়, আমাদের রাজনীতি ও শাসনব্যবস্থাকে কলুষমুক্ত এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হলে পদ্ধতিগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক অনেক সংস্কারও আবশ্যক। এই অনুভূতির ভিত্তিতে এবং আমাদের কাজকে আরও বৃহত্তর আঙ্গিকে পরিচালনার লক্ষ্যে ২১ ডিসেম্বর ২০০৩ 'সিএফই'-এর নাম পরিবর্তন করে 'সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক' রাখা হয়। এই পর্যায়ে আরও অনেক সংগঠন ও ব্যক্তি আমাদের কাজের সঙ্গে যুক্ত হন, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন এ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল, জনাব সেলিনা হোসনে, অধ্যাপিকা মাহফুজা খানম, জনাব আবদুল হক, জনাব জাকির হোসেন প্রমূখ।

সংগঠনের যাত্রাপথের শুরুতেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে 'সুজন'কে পরিবর্তনকামী নাগরিকদের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে গড়ে তোলা হবে। এটি সরকার ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষের ওপর বিভিন্ন ইস্যুতে চাপ সৃষ্টি করবে। এটি মূলত স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে পরিচালিত হবে। সংগঠনটি পরিচালনার জন্য কোনো বৈদেশিক সাহায্য নেওয়া হবে না।

ভোটারদের তথ্যভিত্তিক ক্ষমতায়নের এসব অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে জনাব আব্দুল মোমেন চৌধুরী ও তার দুই সহকর্মী বাংলাদেশ হাইকোর্টে পূর্বে উল্লিখিত রিটটি দায়ের করেন। প্রধান নির্বাচন কমিশনার জনাব এম এ সাঈদের নেতৃত্বে গঠিত নির্বাচন কমিশন রিটের বিরোধিতা (contest) করেনি। ফলে আদালত দ্রুততার সঙ্গেই প্রার্থীদের থেকে হলফনামার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের এবং তা গণমাধ্যমের সহায়তায় ভোটারদের মধ্যে বিতরণের জন্য নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ দেন। প্রসঙ্গত, ভারতীয় সুপ্রিম কোর্ট

'ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়া বনাম অ্যাসোসিয়েশন অব ডেমোক্রেটিক রিফর্মস' মামলার রায়ে প্রার্থীদের সম্পর্কে ভোটারদের তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত করে, যা সম্পর্কে পরবর্তী সময়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

হাইকোর্টের রায় ঘোষিত হবার পর অষ্টম জাতীয় সংসদের পাঁচটি উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম উপনির্বাচনটি অনুষ্ঠিত হয় ২০ জুলাই ২০০৫, সুনামগঞ্জ-৩ আসনে। নির্বাচনের প্রাক্কালে বিচারপতি এম এ আজিজের নেতৃত্বে গঠিত নির্বাচন কমিশন সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারের কাছে ১৮ জুন ২০০৫ পাঠানো একটি 'বিশেষ পরিপত্রে' প্রার্থীদের প্রদত্ত তথ্য হলফনামা আকারে গ্রহণ করার এবং তা ভোটারদের জ্ঞাতার্থে বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশ করার নির্দেশ দেন। পরিপত্রে বলা হয়:

'জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীদের বিভিন্ন তথ্যাবলি প্রদান সম্পর্কে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে দাখিলকৃত রিট পিটিশন নাম্বার ২৫৬১/২০০৫-এর প্রেক্ষিতে মাননীয় আদালত ২৪ মে ২০০৫ কতিপয় নির্দেশ প্রদান করেছেন...। মাননীয় আদালতের আদেশ অনুসারে ... মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় প্রার্থীগণ নির্ধারিত হলফনামায় রিটার্নিং অফিসারের নিকট বিভিন্ন তথ্যাদি দাখিল করবেন। এ সকল তথ্যাদি ভোটারদের জ্ঞাতার্থে বিভিন্ন গণমাধ্যমে রিটার্নিং অফিসারকে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে। বর্ণিত অবস্থায় মাননীয় আদালতের আদেশ কার্যকর করার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।'

সুনামগঞ্জ-৩ আসনের উপনির্বাচনের সময় সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসার হলফনামায় প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে এর একটি সারাংশ প্রকাশ করেন। কিন্তু আমরা 'সুজন'-এর পক্ষ থেকে মূল হলফনামার অনুলিপি চাইলেও তা প্রদানে তিনি অস্বীকৃতি জানান। অন্যান্য উপনির্বাচনেও একই ঘটনা ঘটে। নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকেও এ ব্যাপারে কোনোরূপ সহযোগিতা পাওয়া যায়নি। বস্তুত, কমিশনের পক্ষ থেকে দাবি করা হয় যে, যেহেতু আদালতের রায়ে তথ্য না দিলে কোনো শাস্তির বিধান রাখা হয়নি, তাই প্রার্থীদের পক্ষে তথ্য প্রদান ঐচ্ছিক (directory), বাধ্যতামূলক (mandatory) নয়। উল্লেখ্য, এমনি প্রেক্ষাপটে আমরা 'সুজন'-এর উদ্যোগে তথ্য প্রদানসংক্রান্ত হাইকোর্টের রায়টি বাস্তবায়নের জন্য ২০০৫ সালের জুলাই মাসে একটি রিট (২০০৫ সালের ৫০৬৯ নম্বর রিট) দায়ের করি।

হাইকোর্টের রায় ঘোষণার পর জনৈক আবু সাফার পক্ষে সম্পূর্ণ গোপনে ৩ জুলাই ২০০৫ এটির বিরুদ্ধে আপিল দায়ের করা হয়। আপিলটি দায়ের করেন জনাব আজমালুল হোসেন কিউসির নেতৃত্বে একদল আইনজীবী, যাঁদের অন্যতম ছিলেন ব্যারিস্টার ওমর সাদাত।

আবু সাফার পক্ষে আপিল আবেদনে দাবি করা হয় যে, তিনি দারিদ্র্যের কারণে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করার সুযোগ পান। তবে নিজ চেষ্টায় তিনি স্বশিক্ষিত এবং নিজ এলাকা সন্দ্বীপের অনেক স্কুল ও কলেজের সঙ্গে জড়িত। তিনি একজন নিবেদিতপ্রাণ রাজনীতিবিদ ও সমাজকর্মী। তিনি নিজ চেষ্টায় বিত্তবান হয়েছেন এবং এলাকায় একজন দানশীল ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত। সাফার পক্ষে আরও দাবি করা হয় যে, তিনি একজন অতি জনপ্রিয়, জনগণের আস্থাভাজন ও গুরুত্বপূর্ণ নেতা এবং তিনি আগামী সংসদ নির্বাচনে একজন সম্ভাব্য প্রার্থী। তাই হলফনামার মাধ্যমে তার শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রকাশ করলে এটি তার বিরুদ্ধে যাবে। এ ছাড়া হাইকোর্টের রায় সংবিধানের ৬৬ অনুচ্ছেদে বর্ণিত সংসদ সদস্যদের যোগ্যতা-সম্পর্কিত অনুচ্ছেদের পরিপন্থী এবং বৈষম্যমূলক। উপরন্তু, হাইকোর্টের রায়টি গণতন্ত্রের মূল কাঠামোর

(basic structure of democracy) সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ বলে একটি উদ্ভট যুক্তি আপিল আবেদনে উত্থাপন করা হয় – যুক্তিটি উদ্ভট এই কারণে যে, গণতন্ত্রের মৌলিক কাঠামো বলতে কোনো তত্ত্ব নেই। সুতরাং তিনি জনস্বার্থে আপিলটি দায়ের এবং হাইকোর্টের রায়ের ওপর স্থগিতাদেশ প্রার্থনা করেন।

পরবর্তীকালে, ৬ এপ্রিল ২০০৬, মাননীয় প্রধান বিচারপতি সৈয়দ জে আর মোদাচ্ছের হোসেনের নেতৃত্বে তিন সদস্যের আপিল বিভাগের একটি বেঞ্চ আবু সাফার 'লিভ টু এপিল' বা আপিল আবেদন (২০০৫ সালের আপিল নম্বর ৭৬৬) গ্রহণ করেন। বিচারপতি এম এম রুহুল আমিন ও বিচারপতি আমিরুল কবির চৌধুরী ছিলেন বেঞ্চের অন্য দুজন বিচারপতি। সাফার আপিল আবেদন গ্রহণ করে মামলাটি পরবর্তীকালে শুনানির জন্য আদালত নির্দেশ দেন। আপিল আবেদন শুনানিকালে মাননীয় আদালত বিবেচনায় নিতে ব্যর্থ হয়েছেন যে, আবু সাফা একজন নিবেদিতপ্রাণ সমাজকর্মী এবং স্থানীয়ভাবে জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতা হলে তার শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কে ভোটারদের জানার কথা। তবে মাননীয় বিচারপতিগণ হাইকোর্টের রায়ের ওপর সাফার স্থগিতাদেশের আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন।

আপিল আবেদনটি ছিল সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক, কারণ আবু সাফা ছিলেন একজন তৃতীয় পক্ষ এবং মূল মামলার সঙ্গে তার কোনো সম্পৃক্ততা ছিল না। প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং নির্বাচন কমিশন ছিলো মূল মামলার বিবাদী। বিশেষ পরিস্থিতি ছাড়া সাধারণত তৃতীয় পক্ষকে কোনো মামলার রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করতে দেওয়া হয় না। তবু অজ্ঞাত কারণে সাফার পক্ষে আপিল আবেদনটি শুনানির জন্য গৃহীত হয়। এই সংবাদ শোনার পর মামলার মূল বাদীরা আদালতে ক্যাভিয়েট (caveat) দায়ের করে আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চে শুনানির জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন।

উল্লেখ্য, আপিল আবেদনের (লিভ টু এপিল) শুনানিটিও ছিল একতরফা ও অস্বাভাবিক। এটি একতরফা হওয়ার কারণ হলো, মূল মামলার বাদীদের জালিয়াতির মাধ্যমে আপিল আবেদনের নোটিশও প্রদান করা হয়নি। মামলার নথিতে শুধু বাদীদের নাম ও বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট – এই ঠিকানা লিখে পাঠানো হয়, যা তাদের কাছে পৌঁছেনি। আমাদের জানা মতে, নির্বাচন কমিশনেও এ ব্যাপারে কোনো নোটিশ পাঠানো হয়নি। দুর্ভাগ্যবশত, এটি একটি অতি জনগুরুত্বপূর্ণ মামলা সত্ত্বেও আদালত বাদীদের অনুপস্থিতি নিয়ে কোনো প্রশ্ন তোলেননি।

আরেকটি অস্বাভাবিক ও ভয়াবহ ঘটনা ঘটে ১৯ ডিসেম্বর ২০০৬ – ২২ জানুয়ারি ২০০৭ অনুষ্ঠেয় নির্বাচনের মনোনয়নপত্র দাখিলের দুই দিন আগে। ওই দিন আবু সাফার আইনজীবীগণ আদালত শীতকালীন অবকাশে যাওয়ার পরপর অবসরকালীন বেঞ্চের চেম্বার জজ বিচারপতি মো. জয়নুল আবেদীনের শরণাপন্ন হন এবং বাদীদের অনুপস্থিতিতে হাইকোর্টের রায়ের ওপর স্থগিতাদেশ নেন। প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী, ক্যাভিয়েট দেওয়া থাকলে একতরফা শুনানি হয় না এবং আদালত সব পক্ষের উপস্থিতি নিশ্চিত করেন, যা বিচারপতি মো. জয়নুল আবেদীন করেননি। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বিচারপতি মো. জয়নুল আবেদীনের রায়টি ছিল সম্পূর্ণরূপে জনস্বার্থের পরিপন্থী।

স্থগিতাদেশ প্রার্থনায় আবু সাফা তার মূল আপিল আর্জিতে নিজের যোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা সম্পর্কে উল্লেখ করা বিষয়গুলোরই পুনরাবৃত্তি করেন। একই সঙ্গে দাবি করেন যে, তিনি ২২ জানুয়ারি অনুষ্ঠেয় নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র 'ক্রয়' করেছেন (যদিও মনোনয়নপত্র ক্রয় করতে হয় না)। কিন্তু আবু সাফা চট্টগ্রাম জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয় থেকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন – এমন কোনো

প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায়নি। অনুসন্ধান থেকে আরও জানা যায়, এমনকি চট্টগ্রাম-৩ (সন্দ্বীপ) এলাকার ভোটার তালিকায়ও তার নাম নেই। এ ছাড়া স্থগিতাদেশ পাওয়া সত্ত্বেও তিনি নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র দাখিল করেননি। পরবর্তীকালে অবশ্য আদালতে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, আবু সাফার দাবি সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং পুরো বিষয়টিই কোনো স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহলের পক্ষ থেকে একটি বড় ধরনের জালিয়াতির অংশ।

বিচারপতি মো. জয়নুল আবেদীনের প্রদত্ত স্থগিতাদেশটি আরও কয়েকটি দিক থেকেও অস্বাভাবিক ছিল। প্রথমত, প্রধান বিচারপতিসহ তাঁর তিনজন জ্যেষ্ঠ সহকর্মী হাইকোর্টের রায়ের ওপর স্থগিতাদেশ দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেও চেম্বার জজ হিসেবে একতরফা শুনানির মাধ্যমে তিনি তা করতে দ্বিধা করেননি। দ্বিতীয়ত, সুপ্রিম কোর্টের অধিবেশন চলাকালীন বিষয়টি উত্থাপন না করে জনাব সাফার আইনজীবীরা আদালতের অবকাশে যাওয়ার মাত্র চার দিনের মাথায় স্থগিতাদেশের আবেদন করেন এবং মাননীয় বিচারপতি এ ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন তোলেননি। তৃতীয়ত, বিচারপতি মো. জয়নুল আবেদীন বিবেচনায় নেননি যে, মূল মামলার বিবাদী, প্রধান নির্বাচন কমিশনার জনাব এম এ সাঈদ এবং নির্বাচন কমিশন হাইকোর্টের রায়টির বিরুদ্ধে আপিল আবেদন করেননি। এ ছাড়া বিচারপতি আজিজের নেতৃত্বে পুনর্গঠিত কমিশন ইতিমধ্যে পাঁচটি উপনির্বাচনে, লোক দেখানোভাবে হলেও, রায়টি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয় এবং হলফনামার মাধ্যমে প্রদত্ত তথ্যগুলো সম্পর্কে ব্যাপক জন-আগ্রহ সৃষ্টি হয়। শুধু পাঁচটি উপনির্বাচনেই নয়, ২০০৫ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদের ৪৫টি সংরক্ষিত মহিলা আসনেও রায়টি কার্যকর করা হয়।

বস্তুত, রায়টি ইতিমধ্যে নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলতেও শুরু করেছে। উদাহরণস্বরূপ, ২০০৫ সালের আগস্ট মাসে ফরিদপুর-১ আসনের উপনির্বাচনে কাজী সিরাজুল ইসলামকে, যিনি আওয়ামী লীগ থেকে সংসদ সদস্য হয়ে পরবর্তীতে বিএনপিতে যোগদান করেন, চারদলীয় জোটের পক্ষ থেকে মনোনয়ন দেওয়া হয়। মনোনয়ন ঘোষণার পর *প্রথম আলো*র ৯ আগস্ট ২০০৫ সংখ্যায় 'ফরিদপুর-১ উপনির্বাচনে তথ্য গোপন করেছেন বিএনপি প্রার্থী কাজী সিরাজ' শিরোনামে প্রথম পৃষ্ঠায় একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়, 'হাইকোর্টের নির্দেশিত প্রার্থীদের আট দফা তথ্যের হলফনামায় তিনি ঢাকার মিরপুর থানায় তার বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলার কথা উল্লেখ করেননি।' পরের ঘটনা ইতিহাসের অংশ – চারদলীয় জোট সরকার কাজী সিরাজের মনোনয়ন বদল করে অপর প্রার্থী শাহ্ জাফরকে মনোনয়ন প্রদান করে।

স্থগিতাদেশটির ব্যাপারে আরেকটি বড় অস্বাভাবিকতা হলো যে, আবু সাফার শুধু শিক্ষা-সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশের ব্যাপারে আপত্তি থাকলেও বিচারপতি মো. জয়নুল আবেদীন হাইকোর্টের পুরো রায়ের ওপরই স্থগিতাদেশ প্রদান করেন। এ ছাড়া তিনি শুধু আবু সাফার ক্ষেত্রে স্থগিতাদেশ না দিয়ে ঢালাওভাবে সব প্রার্থীর ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য করেন। প্রসঙ্গত, রায়টি ঘোষণার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এটি নির্বাচন কমিশনে পৌঁছে যায় এবং কমিশন অবিশ্বাস্য দ্রুততার সঙ্গে একই দিনে প্রজ্ঞাপন জারি করে এটি কার্যকর করে। এ থেকেও সুস্পষ্ট যে পুরো জালিয়াতির পেছনে কোনো প্রভাবশালী স্বার্থান্বেষী মহলের ইন্ধন ছিল।

আদালত স্থগিতাদেশ জারি করার পর আমরা 'সুজন'-এর পক্ষ থেকে আবু সাফার প্রদত্ত ঠিকানায় তাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করি। কিন্তু সন্দ্বীপে পাঠানো আমাদের প্রতিনিধি তাকে খুঁজে পায়নি। তবে অনুসন্ধান থেকে জানতে পারা যায়, আপিল আবেদন ও রায় স্থগিতাদেশের আবেদনে আবু সাফার পক্ষে

আদালতে দেওয়া প্রায় সব তথ্যই বানোয়াট ও বিভ্রান্তিকর। এ ছাড়া আদালতের কাছে তার সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যও গোপন করা হয়েছে। যেমন: তিনি পাকিস্তান-ফেরত একজন সাধারণ সৈনিক যদিও মামলার আর্জিতে সন্দ্বীপের ঠিকানা ব্যবহার করা হয়, তিনি সেখানে থাকেন না। আপিল দায়েরের অন্তত পাঁচ বছর আগে থেকেই তিনি সেখানে যান না। এমনকি তার মায়ের জানাজায়ও তিনি অনুপস্থিত ছিলেন। তার শিক্ষানুরাগ, দানশীলতা, সমাজকর্ম ও রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার দাবি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন।

স্থানীয়দের মতে, আবু সাফা একজন প্রতারক। তার স্ত্রী, সন্তান ও প্রতিবেশীদের তথ্যমতে, প্রথম স্ত্রীর অনুমতি ছাড়াই তিনি একাধিক বিয়ে করেছেন। তাদের ধারণা, তিনি ঢাকায় নৈশপ্রহরীর কাজে নিয়োজিত। তবে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর এলাকায় অনেক খোঁজাখুঁজির পরও আমরা তার সন্ধান পাইনি। প্রসঙ্গত, এ সময় আবু সাফাকে নিয়ে *প্রথম আলো*ও (২৪ ডিসেম্বর ২০০৬) একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ করে। প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল: 'সুপ্রিম কোর্টে আবু সাফার আবেদন – সন্দ্বীপে তার স্বজনেরা হেসেই খুন।' অর্থাৎ আবু সাফার পক্ষে আদালতে উত্থাপিত সব তথ্য অসত্য ও বানোয়াট। এমনি প্রেক্ষাপটে আমরা 'সুজন'-এর পক্ষ থেকে আবু সাফার জালিয়াতির বিষয়ে জনমত সৃষ্টির জোর প্রচেষ্টা চালাই।

এই পর্যায়ে আমরা 'সুজন' থেকে মামলার পক্ষভুক্ত হওয়ার আবেদন করি, কিন্তু আদালত তা অগ্রাহ্য করেন। একই সময়ে মূল বাদীপক্ষের আইনজীবী ড. কামাল হোসেন আবু সাফার পক্ষ থেকে জালিয়াতির মাধ্যমে আপিল দায়ের এবং স্থগিতাদেশের আবেদন করার বিষয়টি আদালতের দৃষ্টিতে আনেন। তিনি ১০ জানুয়ারি ২০০৭ অনুষ্ঠিত শুনানিতে 'সুজন' কর্তৃক সংগৃহীত তথ্যগুলো আদালতে উত্থাপন করেন এবং জালিয়াতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানান। ড. কামাল হোসেন ২০০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে বিচারপতি মো. জয়নুল আবেদীন কর্তৃক প্রদত্ত স্থগিতাদেশটি খারিজ করার আবেদন করেন। তিনি আপিলের 'মেইন্টেনিবিলিটি' বা বৈধতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। আবু সাফার বিরুদ্ধে জালিয়াতির অভিযোগগুলো উত্থাপনের পর্যায়ে তার কৌঁসুলি আজমালুল হোসেন কিউসি, মাহাবুবুর রহমানসহ অন্যান্য সিনিয়র আইনজীবী মামলা থেকে অব্যাহতি নেন। পরবর্তীকালে ব্যারিস্টার ওমর সাদাতই মূলত এককভাবে মামলাটি পরিচালনা করেন।

এমনি প্রেক্ষাপটে, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০০৭, সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে একটি অত্যন্ত অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটে। ওই দিন সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে ড. কামাল হোসেনের আপিলের 'মেরিট' বা যৌক্তিকতার বিষয়ে বক্তব্য উত্থাপন করার আগেই বিচারপতি জে আর মোদাচ্ছের হোসেনের নেতৃত্বে এবং বিচারপতি এম ফজলুল করিম, বিচারপতি আমিরুল কবির চৌধুরী ও বিচারপতি মো. জয়নুল আবেদীনের সমন্বয়ে গঠিত আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ প্রার্থীদের সম্পর্কে ভোটারদের তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার প্রতিষ্ঠা করা ২০০৫ সালের হাইকোর্টের রায়টি খারিজ করে দেন, অর্থাৎ সম্পূর্ণ বানোয়াট তথ্য ব্যবহার করে দায়ের করা আপিলটি গ্রহণ করেন। আদালতের এই অনাকাঙ্ক্ষিত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বে আইনজীবীরা প্রতিবাদ করেন। প্রবল প্রতিবাদের মুখে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই নাটকীয়ভাবে রায়টি প্রত্যাহার করা হয়।

পরবর্তীকালে ২৮ নভেম্বর ২০০৭ প্রধান বিচারপতি এম রুহুল আমিনের নেতৃত্বে গঠিত আপিল বিভাগ আবু সাফাকে আদালতে হাজির করার জন্য অ্যাডভোকেট-অন-রেকর্ড মো. নওয়াব আলীকে নির্দেশ

দেন। জনাব নওয়াব আলী আদালতের এই নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হন এবং ১১ ডিসেম্বর ২০০৭ আদালতে হলফনামা দায়ের করে বলেন যে, আবু সাফা বিরূপ প্রচারের (adverse publicity) ভয়ে আদালতে হাজির হননি। এমতাবস্থায় আদালতের নির্দেশ অমান্য করার লক্ষ্যেই এ অজুহাত দাঁড় করানো হয়েছে বলে বিচারপতিগণ তাঁদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। একই দিনের প্রদত্ত রায়ে আদালত বলেন:

'In the background of the afore state of the matter we are of the view that the appeal being Civil Appeal No. 57 of 2006 was filed by non-genuine person upon using imaginary name of a person and that upon using fabricated papers. Such manner of filing a case is highly deprecable one and as such (is) strongly disapproved by the Court. The Advocate-on-record is cautioned as well as warned from repeating such kind of thing in the future.

'Since the appeal has been filed by fabricating paper which (is) highly condemable in law and consequently there being no appeal in the eye of law we are not entering into the merit of the appeal.

'The appeal is dismissed since the appeal was filed by using fabricated and non-genuine papers and for non-compliance of the Court's order dated November 28, 2007.'

'২০০৬ সালের সিভিল আপিল নং ৫৭ সঠিক ব্যক্তি দ্বারা দাখিল করা হয়নি এবং এতে কাল্পনিক ব্যক্তির নাম ও ভুয়া কাগজপত্র ব্যবহার করা হয়েছে। এভাবে মামলা দায়ের করা একটি গর্হিত কাজ এবং তা আদালতের কাছে কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। অ্যাডভোকেট-অন-রেকর্ডকে ভবিষ্যতে এ ধরনের কাজের পুনরাবৃত্তি না করার জন্য সাবধান করে দেওয়া হয়েছে।

'যেহেতু ভুয়া কাগজপত্র ব্যবহার করে আপিলটি দাখিল করা হয়েছে, যা আইনের দিক থেকে অত্যন্ত নিন্দনীয়, তাই আইনের দৃষ্টিতে এটি আপিলই হয়নি। তাই আমরা আপিলের যৌক্তিকতার বিষয়ে কিছুই বলছি না।

'আপিলটি খারিজ করে দেওয়া হলো, যেহেতু এটি ভুয়া কাগজপত্র ব্যবহার করে বেঠিক ব্যক্তি দ্বারা দাখিল করা হয়েছে এবং আদালতের ২৮ নভেম্বর ২০০৭ তারিখের নির্দেশ মানা হয়নি।'

শুধু প্রার্থীদের সম্পর্কে ভোটারদের তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার বিষয়েই নয়, ২০০৪ সাল থেকে আমরা 'সুজন'-এর পক্ষ থেকে রাজনৈতিক সংস্কারের দাবিতে দেশব্যাপী একটি আন্দোলন গড়ে তুলতে সচেষ্ট হই। এই লক্ষ্যে সমাজের সর্বস্তরের অসংখ্য ব্যক্তির সঙ্গে আমাদের মতবিনিময়ের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা ধারণাগুলো ২০০৪ সালের এপ্রিল মাসে *প্রথম আলো* ও *দ্য ডেইলি স্টার*-এর সঙ্গে যৌথভাবে একটি বিস্তারিত সংস্কার প্রস্তাব হিসেবে উত্থাপন করা হয়। নির্বাচন প্রক্রিয়া, ভোটারদের তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার, নির্বাচন কমিশন ও রাজনৈতিক দলের সংস্কারের লক্ষ্যে কতগুলো সুস্পষ্ট দাবি প্রস্তাবে সন্নিবেশিত হয়। আন্দোলনের অংশ হিসেবে আমরা সারা দেশে গোলটেবিল আলোচনা, সংবাদ সম্মেলন, মানববন্ধন,

নির্বাচনী অলিম্পিয়াড, নির্বাচনী বিতর্কসহ নানা ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করি। 'নির্বাচনী অলিম্পিয়াড' অনুষ্ঠানে আমাদের সঙ্গে মিডিয়া পার্টনার হিসেবে ছিলো বেসরকারি টেলিভিশন 'চ্যানেল আই'। গণমাধ্যমের সহায়তায় আমাদের কার্যক্রম সারা দেশে বহুল প্রচারিত হয়। ফলে সৃষ্টি হয় ব্যাপক জনমত।

স্মরণ করা যেতে পারে যে, ২০০৫ সালের ১৫ জুলাই অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে ১১ দলের পক্ষে আওয়ামী লীগের সভানেত্রী ও সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা শেখ হাসিনা 'অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের লক্ষ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার, নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচনী ব্যবস্থার সংস্কারের রূপরেখা' জাতির সামনে উত্থাপন করেন। রূপরেখায় নির্বাচন কমিশনকে 'স্বাধীন ও কার্যকর' প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্যে ১৫টি সুস্পষ্ট অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়। একই সঙ্গে নির্বাচনী আইন ও বিধির সংস্কারের লক্ষ্যে ১১টি শিরোণামে মোট ৩০টি প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। শিরোণামগুলো ছিল: নির্বাচনে টাকার খেলা বন্ধ করা; প্রার্থীদের সম্পদ ও পরিচয় প্রকাশ; প্রার্থী হওয়ার যোগ্যতা; নির্বাচনকে সন্ত্রাস, পেশিশক্তির প্রভাব ও দুর্বৃত্তমুক্ত করা; নির্বাচনে ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার ব্যবহার রোধ করা; নির্বাচনে সবাইকে সমান সুযোগদান; নির্বাচন পরিচালনায় স্বচ্ছতা বিধান; নির্বাচনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ভূমিকা; রাজনৈতিক দলের আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক চর্চা নিশ্চিত করা; রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ এবং সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংখ্যা বৃদ্ধি ও সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা। শেখ হাসিনা জাতীয় সংসদেও এসব প্রস্তাব উত্থাপন করেন। পরবর্তীকালে ২২ নভেম্বর ২০০৫ পল্টন ময়দানের জনসভায় ১৪ দলের পক্ষ থেকে উপরিউক্ত প্রস্তাবগুলোর ভিত্তিতে একটি 'অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচি' ঘোষণা করা হয়। উল্লেখ্য, 'সুজন'-এর ২০০৪ সালে প্রস্তাবিত সংস্কার প্রস্তাবের প্রায় সবগুলোই ১১ দলের সংস্কারের রূপরেখা এবং মহাজোটের অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয়।

'সুজন'-এর সংস্কার প্রস্তাব এবং প্রার্থীদের সম্পর্কে ভোটারদের তথ্যপ্রাপ্তির অধিকারের বিধান অন্তর্ভুক্ত করে আমরা পরবর্তীকালে *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ,* ১৯৭২-এর সংশোধনের লক্ষ্যে আইনের একটি খসড়া তৈরি করি। ড. ইয়াজউদ্দিনের নেতৃত্বে গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং বিচারপতি এম এ আজিজের নেতৃত্বে গঠিত নির্বাচন কমিশন আমাদের কাছ থেকে খসড়াটি গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। পরে অবশ্য আমরা এটি ড. এ টি এম শামসুল হুদা, জনাব ছহুল হোসাইন ও ব্রিগেডিয়ার (অব.) শাখাওয়াত হোসেনের সমন্বয়ে পুনর্গঠিত নির্বাচন কমিশনের কাছে হস্তান্তর করি। একই সঙ্গে আমরা হলফনামার খসড়া তৈরি করেও কমিশনকে প্রদান করি। আমাদের প্রস্তাবিত আইনের খসড়ায় অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে গণমাধ্যমের সহায়তায় আমরা সারা দেশে ব্যাপক জনমত সৃষ্টিরও প্রচেষ্টা চালাই।

নির্বাচন কমিশন পরবর্তীকালে আমাদের অধিকাংশ প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করে একটি খসড়া আইন তৈরি করে তা নিয়ে রাজনৈতিক দল ও অন্যান্য স্বার্থসংশ্লিষ্টদের সঙ্গে ব্যাপক আলাপ-আলোচনা চালায়। আলোচনাকালে প্রাপ্ত সুপারিশের ভিত্তিতে একটি চূড়ান্ত খসড়া দাঁড়ায়, যা পরবর্তীকালে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অধ্যাদেশ আকারে জারি করা হয়। অধ্যাদেশে নির্বাচন কমিশনের অধীনে রাজনৈতিক দলের বাধ্যতামূলক নিবন্ধন এবং ভোটারদের তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার, 'না' ভোটের বিধানসহ আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই অধ্যাদেশের ভিত্তিতেই ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

নবম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে অধ্যাদেশটিকে অনুমোদন দেওয়া হয়। তবে 'না' ভোটের বিধানসহ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অধ্যাদেশ থেকে বাদ দেওয়া হয়। যেমন: তত্ত্বাধায়ক সরকারের আমলে প্রণীত অধ্যাদেশে রাজনৈতিক দলের তৃণমূলের সদস্যদের তৈরি 'প্যানেল থেকে' মনোনয়ন বোর্ড সংসদ নির্বাচনে মনোনয়ন চূড়ান্ত করার বিধান অন্তর্ভুক্ত ছিল। এতে পরিবর্তন এনে শুধু দলের তৃণমূলের সদস্যদের 'সুপারিশ বিবেচনায় নিয়ে' মনোনয়ন প্রদানের বিধান সংশোধিত *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ আইন*, ১৯৭২-এর ৯০বি(১)(বি)(iv) ধারায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অর্থাৎ দলীয় মনোনয়ন বোর্ডের পক্ষ থেকে দলের তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের সুপারিশের ভিত্তিতে মনোনয়ন প্রদান আর বাধ্যতামূলক রইল না, যা তাদের প্রদত্ত ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ারই সমতুল্য।

উল্লেখ্য, গত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে গঠিত 'স্থানীয় সরকার গতিশীল ও শক্তিশালীকরণ কমিটি,' বর্তমান লেখক যার একজন সদস্য ছিলেন, স্থানীয় সরকারের সর্বস্তরে প্রার্থীদের সম্পর্কে ভোটারদের তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার প্রতিষ্ঠার সুপারশি করে। কমিটি সংশ্লিষ্ট সবগুলো আইনের খসড়া তৈরি করে তাতে এ বিধান অর্ন্তভুক্ত করে। কিন্তু রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অধ্যাদেশ জারি করার সময় এই বিধান বাদ দেওয়া হয়। তবে এ বিধান নির্বাচনী বিধিমালায় অন্তর্ভুক্ত করে ৪ আগস্ট ২০০৮ অনুষ্ঠিত চারটি সিটি করপোরেশন – খুলনা, রাজশাহী, সিলেট ও বরিশাল – এবং নয়টি পৌরসভা নির্বাচনে তা প্রয়োগ করা হয়। (পৌরসভাগুলো হলো: মানিকগঞ্জ, ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়া, সিলেটের গোলাপগঞ্জ, রাজশাহীর নওহাটা, চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড, চুয়াডাঙ্গা, শরীয়তপুর, বগুড়ার গাবতলী ও গাজীপুরের শ্রীপুর।) এসব নির্বাচনে 'সুজন'-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত স্বেচ্ছাব্রতীরা প্রার্থীদের প্রদত্ত হলফনামা ও আয়কর রিটার্নের কপি নির্বাচন কমিশন থেকে সংগ্রহ করেন। আমাদের নিজস্ব একটি সফটওয়্যার ব্যবহারের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যগুলোর ভিত্তিতে প্রার্থীদের তুলনামূলক চিত্র তৈরি করে তা ভোটারদের মধ্যে বিতরণ এবং ওয়েবসাইটে (www.votebd.org) প্রকাশ করা হয়। তথ্যগুলো সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে গণমাধ্যমের কাছেও বিতরণ করা হয়।

একই সঙ্গে 'প্রার্থী-ভোটার মুখোমুখি' অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়, যেখানে প্রার্থীরা ভোটারদের সামনে নিজেদের বক্তব্য/নির্বাচনী ইশতেহার উপস্থাপন করেন এবং তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সব এলাকায়ই 'আসন্ন নির্বাচনে কেমন প্রার্থী চাই' শিরোনামে নাগরিক সংলাপেরও আয়োজন করা হয়। নাগরিক সংলাপ ও মুখোমুখি অনুষ্ঠানগুলো আয়োজনের ক্ষেত্রে *দ্য ডেইলি স্টার, প্রথম আলো* ও *চ্যানেল আই* আমাদের মিডিয়া পার্টনার হিসেবে কাজ করে। বস্তুত, এসব অনুষ্ঠান গণমাধ্যমের সহায়তায় ব্যাপক প্রচার লাভ করে এবং আমাদের প্রকাশিত তথ্যগুলো অনেক নাগরিকের আলাপ-আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়।

সংস্কার প্রস্তাব তথা পরিবর্তনের পক্ষে সারা দেশে জনমত সৃষ্টির ব্যাপারে টেলিভিশন টক-শোগুলোও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষ ভূমিকা পালন করে বর্তমান লেখকের উপস্থাপনায় 'জনতার কথা' ও 'ভাববার বিষয়' শিরোনামের বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচারিত দুটি অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠান দুটি, বিশেষত 'জনতার কথা' ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করলেও নির্বাচনের পর এগুলোর প্রচারণা বন্ধ হয়ে যায়। সংস্কার প্রস্তাবগুলোর জনপ্রিয়তা অর্জনের ক্ষেত্রে অন্যান্য ইলেকট্রনিক মিডিয়া ও সংবাদপত্রগুলোর ভূমিকাও ছিল অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

চারটি সিটি করপোরেশন ও নয়টি পৌরসভা নির্বাচনের সময় রিটার্নিং অফিসারের দপ্তর থেকে হলফনামা, বিশেষত আয়কর রিটার্নের কপি পেতে আমাদেরকে অনেক প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়। এসব অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে ১৪ সেপ্টেম্বর ২০০৮ আমাদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রার্থীদের প্রদত্ত হলফনামা ও আয়কর রিটার্নের তথ্যগুলো আরও সহজে ও দ্রুততার সঙ্গে যাতে পাওয়া যায়, তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সভায় কয়েকটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

'(ক)রিটার্নিং অফিসার মনোনয়ন ফরম জমা হওয়ার পরপরই সেগুলো স্থানীয়ভাবে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের মনোনয়ন প্রত্যাহারের তারিখের পর প্রতিদ্বন্দ্বী সব প্রার্থীর তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবে।
'(খ)প্রার্থীকে মনোনয়নের সাথে হলফনামা, নির্বাচনী ব্যয়ের উৎসের বিবরণী, আয়কর রিটার্ন ও কর পরিশোধের তিনটি ফটোকপি জমা দিতে হবে। উক্ত তিনটি কপির একটি করে কপি রিটার্নিং অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসের কার্যালয়ে টাঙিয়ে দেয়া হবে এবং বাকি কপি থেকে এনজিও বা অন্যরা যাতে ফটোকপি করে নিতে পারে, সেই সুযোগ প্রদান করতে হবে।'

এ ছাড়া সভায় 'কাউন্টার অ্যাফিডেভিট' (counter affidavit) বা বিরুদ্ধ হলফনামা প্রদানের বিধান রাখারও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, যা পরবর্তী সময়ে ১৭ নভেম্বর ২০০৮ জারি করা পরিপত্র: ৮-এর মাধ্যমে কার্যকর করা হয়। এই বিধানের ফলে যেকোনো ব্যক্তির পক্ষে কোনো প্রার্থীর মনোনয়নপত্রের সঙ্গে দাখিল করা হলফনামায় প্রদত্ত তথ্য চ্যালেঞ্জ করে আরেকটি হলফনামা দাখিল করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। সম্প্রতি পৌর নির্বাচনের সময় বিরুদ্ধ হলফনামা প্রদানের এই বিধান প্রয়োগের কিছু দৃষ্টান্ত আমাদের চোখে পড়েছে।

২৯ ডিসেম্বর ২০০৮ অনুষ্ঠিত নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও অনেক রিটার্নিং অফিসারের দপ্তর থেকে আয়কর রিটার্নের কপি পেতে আমাদের অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, কারণ ১৪ সেপ্টেম্বর ২০০৮ কমিশনের সিদ্ধান্তের পরও কমিশন সচিবালয় থেকে পাঠানো প্রজ্ঞাপনে আয়কর রিটার্নের কপি বিতরণের কথা উল্লেখ ছিল না এবং বহু প্রচেষ্টার পরও আমরা কমিশন কর্মকর্তাদের এ ব্যাপারে একটি সংশোধনী পাঠাতে রাজি করাতে পারিনি। তা সত্ত্বেও বহু কাঠখড় পুড়িয়ে প্রার্থীদের প্রদত্ত হলফনামা ও আয়কর রিটার্ন নির্বাচন কমিশন থেকে সংগ্রহ করে এগুলোতে অন্তর্ভুক্ত তথ্যের ভিত্তিতে মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে প্রার্থীদের তুলনামূলক চিত্র তৈরি করা হয়। মোট ২৯৯টি আসনের (প্রার্থীর মৃত্যুর কারণে একটি আসনে নির্বাচন স্থগিত ছিল) ১৫৬৬ জন প্রার্থীর তথ্য এসব তুলনামূলক চিত্রে সন্নিবেশ করা হয়। তুলনামূলক চিত্রগুলো সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশ ও গণমাধ্যমের কাছে বিতরণ করা হয়। পরবর্তীকালে জাতীয় সংসদের ৫০টি সংরক্ষিত মহিলা আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের প্রদত্ত তথ্য সংগ্রহ করে তা-ও বিতরণ করা হয়। (উল্লেখ্য, সংরক্ষিত মহিলা প্রার্থীদের হলফনামা প্রদানের বিধান এখনো আইনে অন্তর্ভুক্ত হয়নি, যদিও সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে সংবিধান প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নির্বাচন কমিশন সংরক্ষিত আসনের ক্ষেত্রেও তা কার্যকর করে।) এ ছাড়া বর্তমান সংসদের মেয়াদকালে গত তিন বছরে অনুষ্ঠিত ১২টি উপনির্বাচন এবং একটি স্থগিত নির্বাচনেও 'সুজন'-এর পক্ষ থেকে একই ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

তথ্য সংগ্রহ ও বিতরণ ছাড়াও সংসদ নির্বাচনকালে ৮৭টি নির্বাচনী আসনে 'প্রার্থী-ভোটার মুখোমুখি' অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ও দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটিও কয়েকটি অনুষ্ঠান আয়োজনের সঙ্গে জড়িত ছিল। এসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এবং স্বেচ্ছাব্রতীদের

নিজস্ব উদ্যোগে প্রার্থীদের প্রদত্ত তথ্যের তুলনামূলক চিত্রগুলো বিতরণ করা হয়, যা ভোটারদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগায়। মুখোমুখি অনুষ্ঠানগুলোতে প্রার্থীরা লিখিতভাবে অঙ্গীকার করেন যে, তারা নির্বাচনে কোনোরূপ অসদাচরণের আশ্রয় নেবেন না এবং নির্বাচিত হলে তারা জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রতিবছর ভোটারদের মুখোমুখি হবেন এবং স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করবেন না। এ ছাড়া ভোটাররাও প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন যে, টাকা কিংবা অন্য কিছুর বিনিময়ে তারা ভোট বিক্রি করবেন না। প্রতিশ্রুতিগুলোর কপি 'সুজন'-এর ওয়েবসাইটে (www.shujan.org) পোস্ট করা আছে।

হলফনামা আকারে তথ্য প্রদানের বিধান আইনে অন্তর্ভুক্ত করার ফলে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিকে নির্বাচনী অঙ্গন থেকে দূরে রাখা গেছে। তথ্য গোপনের জন্য কারও কারও মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে, যার একটি উদাহরণ বগুড়া-১ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী জনাব শোকরানার প্রার্থিতা বাতিল। এ ছাড়া তথ্য গোপনের অভিযোগে আরও অনেকের প্রার্থিতা বাতিল করার সুপারিশ করেছে নির্বাচন কমিশন। যেমন: ২৮ ডিসেম্বর ২০০৮ দৈনিক ইত্তেফাক-এর একটি শিরোনাম ছিল 'উত্তরাঞ্চলের ১০ প্রার্থীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করেছে ইসি।'

পরবর্তীকালে, ২২ জানুয়ারি ২০০৯ অনুষ্ঠিত উপজেলা নির্বাচনেও আমরা প্রার্থীদের হলফনামা ও আয়কর বিবরণীতে প্রদত্ত তথ্য ব্যবহার করে একই ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করি। এক্ষেত্রেও ৫৭টি উপজেলায় 'প্রার্থী-ভোটার মুখোমুখি' অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রার্থী এবং ভোটাররাও অনুরূপ শপথ গ্রহণ করেন।

এরপর ১৭ জুন ২০১০ অনুষ্ঠিত চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন নির্বাচনেও 'সুজন'-এর স্বেচ্ছাব্রতীরা সব প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর তথ্য সংগ্রহপূর্বক প্রার্থীদের তুলনামূলক চিত্র তৈরি করে ভোটারদের মধ্যে বিতরণ করেন। তথ্যগুলো সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে গণমাধ্যমের কাছে বিতরণ এবং 'সুজন'-এর ওয়েবসাইটেও (www.votebd.org) প্রকাশ করা হয়। অতীতের মতো মেয়র পদপ্রার্থীদের এবং একটি সংরক্ষিত আসনসহ ১১টি ওয়ার্ডে 'ভোটার-প্রার্থী মুখোমুখি' অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এসব অনুষ্ঠানেও প্রার্থী ও ভোটাররা শপথবাক্য পাঠ করেন।

২০১১ সালের জানুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত পৌর নির্বাচনেও একই ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। পৌর মেয়র পদপ্রার্থীদের হলফনামায় প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রার্থীদের তুলনামূলক চিত্র তৈরি করে তা ভোটারদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। তুলনামূলক চিত্রগুলো গণমাধ্যমকে প্রদান এবং 'সুজন'-এর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। এ ছাড়া ৭৫টি এলাকায় 'ভোটার-প্রার্থী মুখোমুখি' অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

ভারতীয় অভিজ্ঞতা

প্রতিবেশী ভারতেও প্রার্থীদের সম্পর্কে ভোটারদের তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার নিয়ে একটি সুদীর্ঘ আন্দোলন পরিচালিত হয়, যা থেকেও আমাদের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয় রয়েছে। ভারতে আন্দোলনটির সূচনা হয় ১৯৬৬ সালে ব্যাঙ্গালোর শহরে। সেখানকার 'পাবলিক অ্যাফেয়ার্স সেন্টার' নামক একটি বেসরকারি সংগঠন ব্যাঙ্গালোর সিটি করপোরেশন নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য একটি প্রশ্নপত্র তৈরি করে। প্রত্যেক প্রার্থীর কাছে জানতে চাওয়া হয়: যে ওয়ার্ড থেকে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা

করছেন, সেই ওয়ার্ডের তিনি কর প্রদানকারী অথবা বাসিন্দা কি না; তার অপরাধের রেকর্ড; স্থানীয় সমস্যাদি সম্পর্কে তার সচেতনতার মাত্রা; নির্বাচিত হলে তিনি কী করবেন, সে ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি; এবং অতীতের অর্জন ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য। পরবর্তী সময়ে একদল স্বেচ্ছাব্রতীর সাহায্যে সংগৃহীত তথ্য তুলনামূলক চিত্র তৈরি করে *দ্য ডেকান হেরাল্ড*-এর সহায়তায় তা প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়। পরীক্ষামূলক এই প্রচেষ্টা ভোটারদের মধ্যে প্রচণ্ড আগ্রহ সৃষ্টি করেছিল এবং এ ধরনের প্রচেষ্টা এখন ভারতের অনেকগুলো পৌরসভায় পরিচালিত হয়।

তথ্যপ্রাপ্তি ও নির্বাচনী সংস্কারের ক্ষেত্রে ভারত গুরুত্বপূর্ণ ধাপ অতিক্রম করেছিল ১৯৯৯ সালে, যখন ভারতের 'আইন কমিশন' তাদের ১৭০তম রিপোর্টে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের তথ্য প্রদান বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ করে। প্রার্থীদের অতীত অপরাধের বিবরণ এবং তাদের সম্পদ ও দেনার পরিমাণ প্রকাশের ওপর ওই রিপোর্টে বিশেষ জোর দেওয়া হয়। 'ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক এলায়েন্স' (এনডিএ) ১৯৯৯ সালে সর্বপ্রথম আইন কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করে।

একই সময়ে 'ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্টের' একদল অধ্যাপকের উদ্যোগে 'অ্যাসোসিয়েশন অব ডেমোক্রেটিক রিফর্মস' (এডিআর) নামক একটি নাগরিক সংগঠন গড়ে ওঠে। সংগঠনটির পক্ষে ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর মাসে দিল্লি হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হয়। মামলার আর্জিতে আদালতের কাছে রাজ্যসভা ও লোকসভা নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সব প্রার্থীর অপরাধের ইতিহাস, আয় ও দেনার তথ্য প্রদান বাধ্যতামূলক করতে নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ প্রদানের আবেদন করা হয়। আবেদনে যুক্তি দেওয়া হয় – স্বাধীনতা ও জীবনের অধিকারের সঙ্গে কার্যকর ও পরিচ্ছন্ন শাসনের বিষয়টি গভীরভাবে সম্পর্কিত। কারণ একমাত্র কার্যকর ও পরিচ্ছন্ন শাসনই স্বাধীনতাকে অর্থবহ করতে পারে। নাগরিকদের অবশ্যই একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের অধিকার রয়েছে এবং যেসব প্রার্থী অতীতে অপরাধী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, সেসব ব্যক্তি সম্পর্কেও তাদের জানার অধিকার রয়েছে। মামলার আর্জিতে আরও বলা হয়, 'তথ্য জানার অধিকার কেবল আইনের অলংকার নয়, বরং এটি মুক্ত চিন্তা ও বাক্ স্বাধীনতা-সম্পর্কিত মৌলিক অধিকারেরই অংশ, যা সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে স্বীকৃত একটি অধিকার।'

আদালত দ্রুততার সঙ্গে ২ নভেম্বর ২০০২ একটি ঐতিহাসিক রায় প্রদান করেন। রায়ে বলা হয়, সংসদীয় গণতন্ত্রে মুক্ত ও সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে ভোটারদেরকে অবশ্যই প্রার্থীদের অতীত ইতিহাস পরিপূর্ণভাবে জানতে হবে, বিশেষ করে প্রার্থীদের অপরাধের তালিকা, সম্পত্তি ও দেনা-সম্পর্কিত তথ্য তাদের জানা অত্যাবশ্যক। সংবিধানের ১৯(১)(এ) অনুচ্ছেদের বরাত দিয়ে আদালত তথ্য প্রদানকে বাক্ স্বাধীনতা ও মুক্তচিন্তার অধিকারের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে সুস্পষ্ট রায় দেন। আদালত নির্বাচন কমিশনকে নিম্নের তথ্যগুলো হলফনামা আকারে প্রার্থীদের মনোনয়নপত্রের সঙ্গে সংগ্রহ করে তা প্রচার করার নির্দেশ দেন: (১) প্রার্থীদের অতীত অপরাধ-সম্পর্কিত তথ্য; (২) প্রার্থীদের, তাদের স্বামী বা স্ত্রী ও নির্ভরশীলদের সম্পদের বিস্তারিত বিবরণ; (৩) প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতার বিবরণ এবং সংসদ সদস্য ও আইনপ্রণেতা হিসেবে তাদের দক্ষতা ও যোগ্যতার তথ্যাদি; (৪) প্রার্থী যে রাজনৈতিক দলের মনোনয়ন নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, সেই দলের দক্ষতা ও যোগ্যতা বিচার করার জন্য নির্বাচন কমিশন যেসব তথ্য জরুরি মনে করবে।

২০০১ সালের জানুয়ারি মাসে বিজেপি'র নেতৃত্বে গঠিত এনডিএ সরকার, কংগ্রেস ও সমতা পার্টি ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টে উপরিউক্ত রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করে। আপিল আবেদনে দাবি করা হয়, রায়টি

ভারতীয় আইনসভার ওপর বিচার বিভাগের অনাকাঙ্ক্ষিত হস্তক্ষেপ। 'পিপলস ইউনিয়ন অব সিভিল লিবার্টিজ' (পিইউসিএল), 'এডিআর' ও 'লোকসত্তা' আপিলের বিরুদ্ধে আদালতে লড়াই করে। প্রসঙ্গত, ৩১ মার্চ ২০০২ ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টের সাবেক প্রধান বিচারপতি এম এন ভেনকাটাচালিয়ার নেতৃত্বে গঠিত 'সংবিধান পর্যালোচনা কমিটি' নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সব প্রার্থীর জন্য হলফনামার মাধ্যমে তাদের সম্পদ ও দায়-দেনার হিসাব দিতে আইনগত বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করার এবং এসব তথ্য জনসমক্ষে প্রকাশের সুপারিশ করে।

পরবর্তীকালে, ২ মে ২০০২ ভারতীয় সুপ্রিম কোর্ট তার রায়ে দিল্লি হাইকোর্টের সিদ্ধান্তকে সামান্য কিছু সংশোধনীসহ বহাল রাখেন এবং পূর্বের রায়ের যৌক্তিকতার প্রতি সমর্থন প্রদান করেন। সুপ্রিম কোর্ট তার রায়ে ভোটারদের তথ্য জানার অধিকারকে ভারতীয় সংবিধানের ১৯(১)(এ) অনুচ্ছেদে ঘোষিত বাক্ স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের মৌলিক অধিকারের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে ঘোষণা করেন। আদালত সংবিধানের ৩২৪তম অনুচ্ছেদের বরাত দিয়ে আরও ঘোষণা করেন যে, রায়টি কার্যকর করার আইনগত এখতিয়ার নির্বাচন কমিশনের রয়েছে। দুই মাসের মধ্যে রায়টি বাস্তবায়নের নির্দেশ দিয়ে আদালত নির্বাচন কমিশনকে প্রার্থীদের অপরাধের তালিকা, সম্পত্তি ও দেনার পরিমাণ এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার বিস্তারিত তথ্য হলফনামা আকারে মনোনয়নপত্রের সঙ্গে জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক করতে নির্দেশ দেন। আদালত প্রার্থীদের কাছে থেকে যেসব তথ্য চাওয়ার সুস্পষ্ট নির্দেশ প্রদান করেন, সেগুলো হলো:

(১) প্রার্থী কোনো ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত/সাজাপ্রাপ্ত/ খালাসপ্রাপ্ত আসামি কি না। যদি হয়ে থাকেন, তাহলে কী দণ্ড – হাজতবাস বা জরিমানা – তাকে দেওয়া হয়েছিল?
(২) মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার অনধিক ছয় মাসের মধ্যে প্রার্থীর বিরুদ্ধে এমন কোনো অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছে কি না, যা দুই বছর বা আরও বেশি কারাবাসের মতো শাস্তিযোগ্য অপরাধ? তার বিরুদ্ধে আদালতে সুনির্দিষ্ট কী অভিযোগ আনা হয়েছিল?
(৩) প্রার্থীর এবং স্বামী/স্ত্রী ও নির্ভরশীলদের সম্পদের পরিমাণ (স্থাবর, অস্থাবর, ব্যাংক ব্যালেন্স ইত্যাদি)।
(৪) প্রার্থীর কোনো দেনা আছে কি-না, বিশেষত কোনো রাষ্ট্রীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা সরকারের কাছে তামাদি বকেয়া আছে কি না, তার তথ্য।
(৫) প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতার বিস্তারিত বিবরণ।

ভারতীয় নির্বাচন কমিশন রায়টি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বেশ প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়। ভারতীয় *গণপ্রতিনিধিত্ব আইন,* ১৯৫১ অনুযায়ী, নির্বাচন কমিশনের বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা নেই। তাই আদালতের নির্দেশিত তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে কমিশন ১৪ মে ২০০২ ভারতীয় আইন, বিচার ও কোম্পানি-বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কাছে *নির্বাচন পরিচালনা বিধি,* ১৯৬১ সংশোধনের মাধ্যমে হলফনামাকে মনোনয়নপত্রের অংশে পরিণত করার লিখিত আবেদন জানায়। এর জবাবে ১৯ জুন মন্ত্রণালয় কমিশনকে সুপ্রিম কোর্টের কাছে সময় বাড়ানোর জন্য আবেদন করতে অনুরোধ জানায়, কারণ সরকার একটি সর্বদলীয় সভা ডেকে এ বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছানোর উদ্যোগ নিয়েছে। এর জবাবে ২১ জুন কমিশন সরকারকে অবহিত করে যে, আদালতের নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য কমিশনের সময় বৃদ্ধির প্রয়োজন নেই, কিন্তু প্রয়োজন মনে করলে সরকার এ ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করতে পারে।

কারও পক্ষ থেকেই সুপ্রিম কোর্টে সময় বাড়ানোর আবেদন না করার এবং সরকার প্রয়োজনীয় বিধি তৈরি করতে অস্বীকৃতি জানানোর পরিপ্রেক্ষিতে, ২৮ জুন ২০০২ ভারতীয় সংবিধানের ৩২৪ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, নির্বাচন কমিশন আদালতের রায় বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একতরফাভাবে পাঁচ পৃষ্ঠার এক নির্দেশনা জারি করে। এতে লোকসভা ও রাজ্যসভা নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সব প্রার্থীকে মনোনয়নপত্রের সঙ্গে একটি হলফনামা জমা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়, যে হলফনামায় সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুযায়ী সব তথ্য অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

পরবর্তী সময়ে সরকার ৮ জুলাই ২০০২ একটি সর্বদলীয় সভা আহ্বান করে, যেখানে কংগ্রেস, বিজেপিসহ ২১টি রাজনৈতিক দল অংশ নেয়। সভায় অংশগ্রহণকারী দলগুলো নির্বাচন কমিশনের ২৮ জুনের নির্দেশনাকে প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে এক অভূতপূর্ব ঐক্যের নজির স্থাপন করে। একই সঙ্গে তারা আইন সংশোধনের মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্টের রায় ও নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা বাতিল করার ঘোষণা দেয়।

সর্বদলীয় সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক, আইন মন্ত্রণালয় *গণপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫১* সংশোধনের একটি খসড়া বিল তৈরি করে এবং ১৫ জুলাই ২০০২ সব রাজনৈতিক দলের কাছে তাদের মতামতের জন্য পাঠায়। প্রস্তাবিত খসড়ায় একটি নতুন ধারা, ৩৩বি সংযুক্ত করা হয়। এই অনুচ্ছেদের বিধানানুযায়ী, আদালতের রায় ও নির্বাচন কমিশনের ইস্যুকৃত নির্দেশনা সত্ত্বেও প্রার্থীর বিরুদ্ধে চলমান মামলা ছাড়া অন্য সব তথ্য – যেমন: শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং সম্পদ ও দায়দেনার হিসাব প্রদানের বিধান রহিত করা হয়। তবে ভারতীয় কংগ্রেস সম্পূর্ণ নাটকীয়ভাবে তাদের মত পরিবর্তন করে এবং ৯ আগস্ট ২০০২ সরকারের কাছে লিখিত এক পত্রে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের প্রতি পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করে। কংগ্রেসের বিরোধিতা সত্ত্বেও এনডিএ সরকার খসড়া বিলটি ১৬ আগস্ট অধ্যাদেশ আকারে জারি করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য পাঠায়। অধ্যাদেশের বিধানগুলোকে ২ মে ২০০২ তারিখ থেকে, অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্টের রায় ঘোষণার দিন থেকে ভূতাপেক্ষ কার্যকারিতা প্রদান করা হয়। অর্থাৎ সরকার রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে সর্বোচ্চ আদালতের সিদ্ধান্তকে ভণ্ডুল করার উদ্যোগ নেয়।

'নির্বাচনী সংস্কারের জন্য জাতীয় প্রচারণা' শীর্ষক ব্যানারে ভারতীয় নাগরিক সমাজের একদল গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধি একই দিনে ভারতের রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে অধ্যাদেশটি অনুমোদন না করার অনুরোধ জানান। তাঁরা জোরালো যুক্তি তুলে ধরেন যে, অধ্যাদেশটির মাধ্যমে সংবিধানের ১৯(১)(এ) অনুচ্ছেদে স্বীকৃত নাগরিকের বাক্ স্বাধীনতার অধিকার খর্ব করা হয়েছে। এই সাক্ষাতের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রপতি এ পি জে আবদুল কালাম ২৩ আগস্ট অধ্যাদেশটি পুনর্বিবেচনার জন্য সরকারের কাছে ফেরত পাঠান, যা সচরাচর ঘটে না। মন্ত্রিসভা অবশ্য অধ্যাদেশটি অপরিবর্তিত রেখে পরের দিনই রাষ্ট্রপতির কাছে পুনরায় পাঠায়, যা অনুমোদন করতে রাষ্ট্রপতি আইনগতভাবে বাধ্য হন।

এরপর, ২০০২-এর সেপ্টেম্বর মাসে 'এডিআর' সুপ্রিম কোর্টে অধ্যাদেশটি চ্যালেঞ্জ করে। 'পিইউসি'ও অনুরূপ আরেকটি আবেদন দায়ের করে। আরেকটি আবেদন দায়ের করা হয় লোকসত্তাসহ ১০টি বেসরকারি সংস্থা এবং কয়েকজন স্বতন্ত্র ব্যক্তির পক্ষ থেকে। মামলার আরজিতে অধ্যাদেশের ৩৩ ধারাকে সংবিধানের ১৯(১)(এ)-এ অন্তর্ভুক্ত নাগরিকের বাক্ স্বাধীনতা তথা মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী বলে দাবি করা হয়। আরও দাবি করা হয় যে, এমনকি সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমেও এ অধিকারকে রহিত করা যায় না – অধ্যাদেশ বা আইনের মাধ্যমে তো নয়ই। অন্যদিকে সরকার ও এনডিএ

আবেদনকারীদের যুক্তি সম্পূর্ণরূপে নাকচ করে দিয়ে দাবি করে যে, প্রার্থীদের অতীত সম্পর্কে জানার অধিকার কোনোভাবেই মৌলিক অধিকারের পর্যায়ে পড়ে না, কাজেই আদালতের এই নির্দেশ আইনের মাধ্যমে বাতিলযোগ্য।

পরবর্তীকালে, ১৩ মার্চ ২০০৩ প্রদত্ত এক রায়ে সুপ্রিম কোর্ট অধ্যাদেশের ৩৩ ধারাকে অবৈধ ও বাতিল বলে ঘোষণা করেন। রায়ে বলা হয়, আদালতের আদেশ উপেক্ষা করার কোনো আইনগত এখতিয়ার ভারতের আইনসভার নেই। রায়ে আরও ঘোষণা করা হয়: 'জনপ্রতিনিধিদের প্রতিষ্ঠান বা আইনসভার নির্বাচনে ভোট দেওয়া নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার, কোনো আলংকারিক বা প্রতীকী বিষয় নয়...পছন্দের প্রার্থীকে ভোট প্রদান, ভোটারের মত প্রকাশের অধিকারেরই অংশ। অর্থাৎ ভোট প্রদান যদিও মৌলিক অধিকার নয়, সাংবিধানিক অধিকার, তবু ভোটের মাধ্যমে নিজের পছন্দ অনুযায়ী প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার মত প্রকাশের স্বাধীনতারই নামান্তর' [*PUCL v. Union of India* (2003) 4 SCC]| তাই পছন্দের প্রার্থীকে ভোট প্রদানের জন্য নাগরিকের তথ্যপ্রাপ্তির অধিকারকে আইন বা বিধি সংশোধনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত, সীমিত বা খর্ব করা যায় না।

আদালত আরও বলেন, 'গণতন্ত্র যাতে গুন্ডাতন্ত্রে (mobocracy) এবং উপহাসে (mockery) বা প্রহসনে (farce) পরিণত না হয়, তা নিশ্চিত করতে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য ভোটারদের তথ্য পাওয়া জরুরি। বিভ্রান্তিকর তথ্য, ভুল তথ্য, তথ্যের অনুপস্থিতি–এ সবই নাগরিকের অসচেতনতার (uniformed) জন্য দায়ী, যার কারণে গণতন্ত্র গুন্ডাতন্ত্র ও প্রহসনে পরিণত হতে বাধ্য।' তাই আদালত তার ২ মে ২০০২ পূর্বের রায়কে পুনর্বহাল ও চূড়ান্ত বলে ঘোষণা করেন।

এরপর ২৫ জুন ২০০৩ ব্যাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত রাজ্য নির্বাচন কমিশনারদের সর্বভারতীয় সম্মেলনে প্রার্থীদের সম্পর্কে ভোটারদের তথ্য জানার অধিকার-সংক্রান্ত সুপ্রিম কোর্টের রায় সব স্থানীয় নির্বাচনেও কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এভাবে সুপ্রিম কোর্টের রায়টি ভারতের সব নির্বাচনে প্রযোজ্য হয়।

সুপ্রিম কোর্টের চূড়ান্ত রায়ের পর নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে লোকসভা ও রাজ্যসভা নির্বাচনে প্রার্থীদের আদালত-নির্দেশিত তথ্য হলফনামার মাধ্যমে মনোনয়নপত্রের সঙ্গে দাখিল করার বিধান-সংবলিত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। এ ছাড়া মূল হলফনামাকে চ্যালেঞ্জ করে কাউন্টার অ্যাফিডেভিট দাখিলেরও অধিকার প্রতিষ্ঠা করে ৭ আগস্ট ২০০৩ কমিশন আরেকটি প্রজ্ঞাপন জারি করে। প্রজ্ঞাপনে রিটার্নিং অফিসারদের এসব তথ্য তাদের নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ এবং অন্যান্য প্রার্থী, গণমাধ্যম ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সরবরাহ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। হলফনামায় মিথ্যা তথ্য প্রদান রোধকল্পে ২ জুন ২০০৪ আরেকটি প্রজ্ঞাপন জারি করে নির্বাচন কমিশন। এতে হলফনামার মাধ্যমে সরকারি কর্মকর্তার কাছে ভুল তথ্য সরবরাহের অভিযোগে তথ্য প্রদানকারীর বিরুদ্ধে ভারতীয় পেনাল কোডের ১৭৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ফৌজদারি আদালতে মামলা করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

প্রসঙ্গত, নির্বাচনে অর্থের প্রভাব হ্রাস করার জন্য ২৯ অক্টোবর ২০০৩ কমিশন আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রজ্ঞাপন জারি করে, যাতে প্রত্যেক প্রার্থীকে তার নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব রাখার জন্য একটি রেজিস্টার খাতা ব্যবহার করতে বলা হয়। খাতাটি দৈনন্দিন খরচের প্রমাণাদিসহ প্রতি তিন দিন পর পর জেলার নির্বাচন কর্মকর্তা/রিটার্নিং অফিসারের কাছে পাঠাতে নির্দেশ দেওয়া হয়। নির্দেশে আরও বলা হয়,

রেজিস্টারের সংশ্লিষ্ট পাতাগুলো যেন রিটার্নিং অফিসারের বোর্ডে প্রদর্শনের ব্যবস্থা এবং ন্যূনতম ফি'র বিনিময়ে আগ্রহী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে সরবরাহ করা হয়।

ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশনা এবং নির্বাচন কমিশনের প্রজ্ঞাপনগুলো নির্বাচনের সময়ে কঠোর ও পরিপূর্ণভাবে প্রয়োগ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, ২০০৪ সালের উত্তর প্রদেশ থেকে রাজ্যসভা নির্বাচনে মনোনয়নপত্রের সঙ্গে হলফনামা যুক্ত না করার কারণে একটি গুরুতর জটিলতা সৃষ্টি হয়। কমিশন ক্ষমতাসীন কংগ্রেসের দুই প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল এবং বিরোধী দলের প্রার্থীদের বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত বলে ঘোষণা করে সপ্তাহব্যাপী এক নাটকের অবসান ঘটায়।

ভারতীয় নির্বাচনে প্রার্থীদের সম্পর্কে ভোটারদের তথ্যপ্রাপ্তির আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিলো সে দেশের নাগরিকদের, বিশেষত গুরুত্বপূর্ণ নাগরিকদের সক্রিয়তা। যেমন: সুপ্রিম কোর্টের প্রথম রায়ের পর ভারতের প্রতিটি রাজ্যে 'ইলেকশন ওয়াচ' নামে একটি মোর্চার আত্মপ্রকাশ ঘটে। এই মোর্চায় বহু গুরুত্বপূর্ণ ভারতীয় নাগরিক জড়িত হন। উদাহরণস্বরূপ, ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টের সাবেক প্রধান বিচারপতি, ভারতীয় মানবাধিকার কমিশনের সাবেক প্রধান ও সংবিধান পর্যালোচনা কমিটির সভাপতি বিচারপতি এম এন ভেনকাটাচালিয়া কর্ণাটক অঙ্গরাজ্যের 'ইলেকশন ওয়াচ'-এর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এমনিভাবে অনেক অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, শিক্ষক, সাবেক সরকারি কর্মকর্তাসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি এসব কাজের সঙ্গে যুক্ত হন।

যেতে হবে আরও অনেক দূর

এটি সুস্পষ্ট যে বাংলাদেশ ও ভারতে সুদীর্ঘ সংগ্রামের ফলে বিভিন্ন নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের সম্পর্কে ভোটারদের তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার বহুলাংশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উভয় দেশেই এখন জাতীয় নির্বাচনে প্রার্থীদের আইনগতভাবে বেশ কিছু ব্যক্তিগত, অপরাধী কর্মকাণ্ডের অভিযোগ-সম্পর্কিত এবং নিজের ও পরিবারের সম্পদ এবং দায়দেনার তথ্য মনোনয়নপত্রের সঙ্গে হলফনামার মাধ্যমে প্রদান করতে হয়। তবে ভারতের সব নির্বাচনে তথ্য প্রদান বাধ্যতামূলক হলেও বাংলাদেশে তা এখনো সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। যেমন: আমাদের সংরক্ষিত মহিলা আসনের নির্বাচন – ভারতে এ ধরনের ব্যবস্থা এখনো নেই – *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ আইন, ১৯৭২*-এর পরিবর্তে *জাতীয় সংসদ (সংরক্ষিত মহিলা আসন) নির্বাচন আইন, ২০০৪*-এর অধীনে পরিচালিত হয়। আর সংরক্ষিত আসনে নির্বাচনের ক্ষেত্রে মনোনয়নপত্রের সঙ্গে হলফনামা ও আয়কর রিটার্নের অনুলিপি দাখিলের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। তবে নির্বাচন কমিশন উপরিউক্ত আইনের ধারা ৮-এর বিধানানুযায়ী সংরক্ষিত আসনে প্রার্থীদের জন্য শুধু হলফনামা প্রদানের বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করেছে। অর্থাৎ সংরক্ষিত আসনের নির্বাচনে প্রার্থীদের আয়কর রিটার্ন প্রকাশ করতে হয় না।

এছাড়া গত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে বাংলাদেশের আমলে বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য প্রণীত সব অধ্যাদেশ প্রার্থীদের তথ্য প্রদানের বিধান রাখা হয়েছিল। কিন্তু নবম জাতীয় সংসদ এসব অধ্যাদেশ অনুমোদন করেনি, যার কারণে এগুলো অকার্যকর হয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে সংসদে পাস করা ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা আইন থেকেও নির্বাচনের আগে হলফনামার মাধ্যমে তথ্য প্রদানের বিধান রহিত করা হয়। সারা দেশে 'সুজন'-এর সাঙ্গে যুক্ত স্বেচ্ছাব্রতীরাও এ ব্যাপারে সোচ্চার ভূমিকা পালন করে। এরই ধারাবাহিকতায় ২৩ নভেম্বর ২০০৯ স্থানীয় নির্বাচনে

ভোটারদের তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'সুজন'-এর কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির পক্ষ থেকে একটি সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এসব দাবির মুখে শেষ পর্যন্ত নির্বাচনী বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা প্রয়োগ করে নির্বাচন কমিশন পৌরসভা নির্বাচনে প্রার্থীদের জন্য হলফনামার মাধ্যমে তথ্য প্রদানের বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করে।

প্রসঙ্গত, জানুয়ারি ২০০৯ এ অনুষ্ঠিত উপজেলা নির্বাচনে সব প্রতিদ্বন্দ্বতাকারীকে হলফনামার মাদ্যমে সাত ধরণের তথ্য প্রদান করতে হলেও নবম জাতীয় সংসদে গৃহীত সংশোধীত উপজেলা পরিষদ আইন থেকে এ বিধান রহিত করা হয়। এ ব্যাপারে কী পরিকল্পনা রয়েছে, তবে উপজেলা আইনে নির্বাচন কমিশনের বিধি প্রণয়নের ক্ষমতাও কেড়ে নেওয়া হয়েছে। তাই আমরা নিশ্চিত নই – পরবর্তী উপজেলা নির্বাচনে প্রার্থীদের তথ্য প্রদানের বাধ্যবাধকতা থাকবে কি না। তবে আমরা আশাবাদী হতে চাই, কারণ 'আলতাফ হোসেন বনাম আবুল কাসেম' [৪৫ ডিএলআর (এডি) (১৯৯৩)] মামলার রায়ের প্রতি নির্বাচন কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষন করার চেষ্টা করি। মামলার রায়ে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ সুস্পষ্টভাবে বলেন যে, সংবিধানের ১১৯ অনুচ্ছেদে অন্তর্ভুক্ত 'তত্ত্বাবধান, নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ' ক্ষমতার অধীনে সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন নিশ্চিত করার স্বার্থে নির্বাচন কমিশন আইনের বিধানের সঙ্গে প্রয়োজনীয় সংযোজনও (supplement) করতে পারে। অর্থাৎ নির্বাচনে ভোটারদের তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করার এখতিয়ার কমিশনের রয়েছে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, স্থানীয় সরকারের অন্যান্য স্তরে প্রার্থীদের হলফনামার মাধ্যমে তথ্য প্রদাণ করতে হলেও , ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রার্থীদের তথ্য প্রদানের বাধ্যবাধকতা সৃষ্টির ব্যাপারে কমিশনকে আমরা সম্মত করাতে ব্যর্থ হই। কমিশনের মতে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার অভাবই তাদের এই অসম্মতির কারণ। কিন্তু কমিশনের এই দাবি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ আদালত ভোটারদের তথ্যপ্রাপ্তির অধিকারকে তাদের বাক্ স্বাধীনতা তথা তাদের মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। আর নাগরিকের মৌলিক অধিকার হরণ করার অধিকার কারোরই নেই। এ ছাড়া সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য স্থানীয় সরকারের অন্যান্য স্তরে ভোটারদের তথ্য দিয়ে ক্ষমতায়িত করা যদি আবশ্যক হয়ে থাকে, তাহলে ইউনিয়ন পর্যায়ে তা প্রযোজ্য হবে না কেন? এ প্রসঙ্গে আরও মনে রাখা প্রয়োজন যে, বাংলাদেশের মোট ৮ কোটি ৫৭ লাখ ভোটারের মধ্যে ৬ কোটি ৯২ লাখ বা ৮১ শতাংশ ভোটারই গ্রামীণ স্থানীয় সরকারের সর্বনিম্ন স্তর ইউনিয়ন পর্যায়ে বসবাস করেন। তাই প্রার্থীদের সম্পর্কে তথ্য পাওয়ার মাধ্যমে ক্ষমতায়িত হওয়ার সুযোগ থেকে তাদের বঞ্চিত করা হলে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর প্রতি, যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ, বৈষম্যমূলক আচরণ করা হবে। উপরন্তু মনোয়নপত্র অনলাইন ফাইলিংয়ের মাধ্যমে অতি সহজেই কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা সমস্যার সমাধান করা যায়।

ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রার্থীদের তথ্য প্রদান বাধ্যতামূলক করতে নির্বাচন কমিশনের অস্বীকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে আমরা 'সুজন'-এর পক্ষ থেকে ২০১০ সালে হাইকোর্টে একটি রিট (২৬৫৫/২০১০) আবেদন করি। বহু কাঠখড় পোড়ানোর পর ২০১১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বিচারপতি ইমান আলী ও বিচারপতি শেখ হাসান আরিফের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চে রিটটির শুনানি হয়। শুনানি শেষে মাননীয় আদালত পরদিন, ২২ ফেব্রুয়ারি, রায় প্রদানের ঘোষণা দেন। কিন্তু পরদিন বেঞ্চের জ্যেষ্ঠ বিচারপতি ইমান আলী আপিল বিভাগের বিচারপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। ফলে আমরা হাইকোর্টের রায় থেকে বঞ্চিত হলাম এবং আমাদের আবার আরেকটি বেঞ্চে ধরনা দিতে হবে। একারণে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে প্রার্থীরা তথ্য দিতে বাধ্য ছিলেন না।

পরিশেষে, আদালতের নির্দেশ ও আইনের বাধ্যবাধকতার কারণে ২৯ ডিসেম্বর ২০০৮ অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে অনুষ্ঠিত স্থগিত ও সব উপনির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রার্থীকে হলফনামার মাধ্যমে তথ্য প্রদান করতে হয়। মনোনয়নপত্রের সঙ্গে প্রায় একই ধরনের হলফনামা দাখিল করতে হয় ২২ জানুয়ারি ২০০৯ অনুষ্ঠিত উপজেলা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের। একই সঙ্গে প্রার্থীদের প্রদান করতে হয় আয়কর রিটার্নের কপি ও সম্ভাব্য নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব। সংরক্ষিত মহিলা আসনের প্রার্থীদেরও হলফনামার মাধ্যমে তথ্য প্রকাশ করতে হয়। নির্বাচন কমিশন বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা ব্যবহার করে পৌরসভা নির্বাচনেও প্রার্থীদের তথ্য প্রদানে বাধ্য করে। এসব সফলতা প্রার্থীদের সম্পর্কে ভোটারদের তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার প্রতিষ্ঠার সুদীর্ঘ আন্দোলনের ফসল। আর এসব তথ্যই বর্তমান প্রকাশনার বিষয়বস্তু।

প্রকাশনাটি দুটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডটি, যা এরই মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে, জাতীয় ও উপনির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের প্রদত্ত তথ্যের সংকলন। এতে ২৯ ডিসেম্বর ২০০৮ নির্বাচনে ২৯৯ আসনে চূড়ান্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ১৫৬৬ জন প্রার্থীর, যার মধ্যে নির্বাচিত সংসদ সদস্যও রয়েছেন, হলফনামা ও আয়কর রিটার্নে প্রদত্ত তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে একটি স্থগিত (নোয়াখালী-১) ও গত তিন বছরে অনুষ্ঠিত মোট ১২টি উপনির্বাচনে (যার মধ্যে দুটি প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন) চূড়ান্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীর তথ্য। আরও যুক্ত করা হয়েছে সংরক্ষিত মহিলা আসনের ৫০ জন প্রার্থীর শুধু হলফনামায় প্রদত্ত তথ্য। অর্থাৎ প্রথম খণ্ডে জাতীয় সংসদে একক আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকা ও সংরক্ষিত আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী মোট ১৬৫৩ জন চূড়ান্ত প্রার্থীর তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে। তবে অনেক প্রার্থীর এবং বেশ কয়েকজন নির্বাচিত সংসদ সদস্যের আয়কর রিটার্ন পাওয়া যায়নি।

দ্বিতীয় খণ্ডে উপজেলা নির্বাচনে চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত প্রতিনিধির – চূড়ান্ত প্রার্থীর নয় – তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মোট চার শ ৮১টি উপজেলা থেকে চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও সংরক্ষিত আসনের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে ২২ জানুয়ারি ২০০৯ এবং তার পরবর্তী সময়ে নির্বাচিত মোট এক হাজার ৪৪৩ জন প্রতিনিধির তথ্য এতে রয়েছে। এদের মধ্যে রয়েছেন চার শ ৮১ জন চেয়ারম্যান, চার শ ৮১ জন সাধারণ আসন থেকে ভাইস চেয়ারম্যান ও চার শ ৮১ জন সংরক্ষিত আসন থেকে নির্বাচিত নারী ভাইস চেয়ারম্যান। নির্বাচিত উপজেলা চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানদের প্রদত্ত তথ্যের কিছু বিশ্লেষণও এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আদালতের নির্দেশ ও আইনের বাধ্যবাধকতার কারণে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের তথ্য প্রদানের বাধ্যবাধকতা নীতিগতভাবে বহুলাংশে বাংলাদেশে স্বীকৃতি লাভ করলেও এর পরিপূর্ণ প্রয়োগ এখনো নিশ্চিত হয়নি। যেমন: প্রার্থীদের প্রদত্ত তথ্য নির্বাচন-পরবর্তীকালে পরিপূর্ণভাবে যাচাই-বাছাই করে মিথ্যা ও বিভ্রান্তিমূলক তথ্য প্রদানকারী এবং তথ্য গোপনকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার গুরুত্বপূর্ণ কাজটি এখনো শুরু হয়নি। মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের ক্ষেত্রেও হলফনামার প্রদত্ত তথ্যগুলোর সত্যতা আরও কঠোরভাবে যাচাই করা আবশ্যক। বিরুদ্ধ হলফনামা প্রদানের বিধানটি সম্পর্কে এখনো অনেকেই জানেন না। তাই তথ্যপ্রাপ্তির অধিকারের পুরো উপকার পেতে তথা নির্বাচনী অঙ্গনকে কলুষমুক্ত করতে হলে আমাদের আরও অনেক দূর যেতে হবে। নিশ্চিত করতে হবে যে ভোটাররা প্রার্থীদের সম্পর্কে সঠিক তথ্য সময়মতো পান এবং সেই তথ্যের ভিত্তিতে জেনে-শুনে-বুঝে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন।

প্রার্থীদের সম্পর্কে তথ্য প্রকাশের উদ্দেশ্য হলো নির্বাচনের দিনে ভোটারদের সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করা। আর ভোটাররা সঠিক সিদ্ধান্ত নিলেই – সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের পক্ষে ভোট প্রদান করলে – আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের গুণমানে পরিবর্তন আসবে, দুর্বৃত্তরা নির্বাচনী অঙ্গন থেকে বিতাড়িত হবে। এর ফলে রাষ্ট্রের সকল স্তরে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হবে। এ জন্য অবশ্য আরও প্রয়োজন হবে নির্বাচনী প্রক্রিয়া, নির্বাচন কমিশন ও রাজনৈতিক দলের অব্যাহত সংস্কার এবং রাজনৈতিক সদিচ্ছা। এই বিধান কার্যকর করার ক্ষেত্রে আদালতের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নাগরিকের সক্রিয়তা।

আশার কথা, নির্বাচনে প্রার্থীদের সম্পর্কে তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার আন্দোলনের কিছু সুফল ইতিমধ্যে আমরা পেতে শুরু করেছি। গত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে তথ্য অধিকার এবং এই অধিকারকে ভণ্ডুল করার উদ্দেশ্যে আদালতে জালিয়াতির ঘটনা নিয়ে যে তুলকালাম কাণ্ড ঘটেছে, তা ভোটারদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে বিরাট ভূমিকা পালন করেছে। ভোটার সচেতনতার ফলে 'সুজন'-এর ব্যানারে যে নাগরিক সক্রিয়তা সৃষ্টি হয়েছে, তা বেশ কিছু বিতর্কিত ব্যক্তিকে নির্বাচনী প্রক্রিয়া থেকে দূরে রাখতে সহায়তা করেছে। এ ছাড়া তথ্য গোপন ও অসত্য তথ্য প্রদানের অভিযোগে কিছু প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে। মনোনয়নপত্র বাছাই এবং নির্বাচন-পরবর্তীকালে তথ্য যাচাই-বাছাইয়ের ব্যাপারে ভবিষ্যতে আরও কঠোরতা অবলম্বন করলে এই সফলতা আরও বহুগুণ বেড়ে যাবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

প্রার্থীদের সম্পর্কে তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার প্রতিষ্ঠার এবং ২০০৩ সাল থেকে এই অধিকার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে 'সুজন' মূলত এককভাবেই ভূমিকা রেখেছে। এই অধিকারকে একটি সর্বব্যাপী আন্দোলনে পরিণত করতে হলে আরও অনেককে এগিয়ে আসতে হবে। তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং এগুলো ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য এগিয়ে আসতে হবে অনেক সংগঠনকে। আরও এগিয়ে আসতে হবে সমাজসচেতন ও চিন্তাশীল নাগরিকদের। দুর্ভাগ্যবশত, আমাদের গুরুত্বপূর্ণ নাগরিকেরা এসব কাজে সাধারণত এগিয়ে আসতে চান না। পক্ষান্তরে প্রতিবেশী ভারতের নাগরিক সমাজ এবং সেখানকার বিশিষ্ট নাগরিকেরা অত্যন্ত সক্রিয় ও সোচ্চার। আমরা আশা করি, নাগরিক হিসেবে অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা পালনে আমাদের বিশিষ্ট নাগরিকেরাও ভবিষ্যতে এগিয়ে আসবেন।

আমরা মনে করি, প্রকাশনাটি একটি ঐতিহাসিক দলিল। এতে অন্তর্ভুক্ত তথ্যগুলো ভবিষ্যতে গবেষকেরা কাজে লাগাতে পারবেন। গণমাধ্যমেরও এটি কাজে লাগবে। সংবাদকর্মীরা প্রকাশনায় অন্তর্ভুক্ত তথ্যগুলোর ভিত্তিতে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি করতে পারবেন। বাংলাদেশের নির্বাচন-প্রক্রিয়া তথা রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরাও তথ্যগুলোকে রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন। এ ছাড়া রাজনৈতিক দলগুলোও তাদের সম্ভাব্য প্রার্থীদের ডেটাবেজ তৈরিতে প্রকাশনাটির সহায়তা নিতে পারে। স্বার্থসংশ্লিষ্ট এসব ব্যক্তির প্রকাশনাটি কাজে লাগলেই আমাদের এই প্রচেষ্টাকে সফল বলে মনে করব।

প্রকাশনাটিতে অন্তর্ভুক্ত তথ্যগুলো সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও বিতরণের ক্ষেত্রে কেন্দ্র, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের 'সুজন' কমিটির নেতারাসহ অসংখ্য স্বেচ্ছাব্রতী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহায়তা করেছেন। বস্তুত, তাঁদের সক্রিয়তা ছাড়া এই দুঃসাধ্য কাজটি করা অসম্ভব হতো। তাঁদের প্রতি জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। একই সঙ্গে 'সুজন'-এর কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী ও জাতীয় কমিটির অনেক সদস্য প্রকাশনাটি বের করার ব্যাপারে বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছেন। বিশেষভাবে সহায়তা করেছেন অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ, জনাব হাফিজউদ্দিন খান, জনাব এ এস এম শাহজাহান, জনাব সুলতানা কামাল,

জনাব সৈয়দ আবুল মকসুদ, অধ্যক্ষ মাহফুজা খানম, অধ্যাপক তোফায়েল আহমেদ, জনাব জাকির হোসেন প্রমুখ। অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থী এবং নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের প্রদত্ত তথ্যের বিশ্লেষণটি লিখেছেন। সাবেক প্রধান বিচারপতি ও সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান প্রকাশনাটির জন্য একটি মুখবন্ধ লিখে আমাদের কৃতার্থ করেছেন। তাঁদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। নির্বাচন কমিশনকে ধন্যবাদ জানাই তথ্যগুলো সরবরাহের জন্য। আমাদের শুভানুধ্যায়ীরা, যাঁদের আর্থিক সহায়তা না পেলে 'সুজন'-এর কার্যক্রম পরিচালনা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াত, তাঁদের প্রতি রইল আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। 'প্রথমা প্রকাশনা'র সঙ্গে জড়িত যেসব ব্যক্তি এই বিশাল কর্মযজ্ঞ সম্পাদন করেছেন, তাঁদেরও ধন্যবাদ জানাই। আমার সহকর্মীরা এ বই প্রকাশের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। তাঁদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

তথ্যগুলো বিশ্লেষণ ও প্রকাশের ব্যাপারে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও কিছু ভুলভ্রান্তি থেকে যেতে পারে, যার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া দলিলগুলো কিছু কিছু ক্ষেত্রে অস্পষ্ট, যার থেকে ভুলের উৎপত্তি হতে পারে। এছাড়া যেভাবে তথ্যগুলো গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে, সেভাবে এগুলো নির্বাচন কমিশন সংগ্রহ করেনি। তাই এগুলো সাজানোর ক্ষেত্রে বিবেচনাশক্তি প্রয়োগ করতে হয়েছে, যা-ও ভুলের কারণ হতে পারে। তবে তথ্যগুলো বর্তমান ফরমেটেই নির্বাচনের সময় বিতরণ করা হয়েছে এবং নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সব প্রার্থীরই এগুলো দেখার সুযোগ হয়েছে এবং কারও থেকেই কোনোরূপ আপত্তি আমরা পাইনি। তা সত্ত্বেও গ্রন্থটি ব্যবহারকারীদের চোখে যদি কোনো ভুল ধরা পড়ে, আমাদের জানালে আমরা পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের উদ্যোগ নেব। এ ছাড়া গ্রন্থে প্রকাশিত তথ্যের সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্যের কোনো অসংগতি পাওয়া গেলে কমিশনের ওয়েবসাইটের তথ্যই সঠিক বলে ধরে নিতে হবে।

ড. বদিউল আলম মজুমদার
সম্পাদক
সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক